প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

আনুমানিক ৫০০০ শব্দের সারসংক্ষেপ

গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম :

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য (১৯৫১-২০০০)

গবেষক

স্বরূপ হালদার

Enrolment Number : Arts/Doc/13-14/48

Registration Number : R14RS02120055

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোস্তাক আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা -৭০০০৭৩

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে লোকসংস্কৃতিকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার প্রবণতা বেশ সহজলভ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপন্যাস পাঠক এমনতর উপন্যাস থেকে সচরাচর আস্বাদন করে থাকেন কাহিনির নির্যাসকে। আর গবেষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খতা। তাই আপাত সহজ, আপাত কাহিনি আস্বাদন ব্যতীত লোসংস্কৃতিনির্ভর উপন্যাসগুলিতে থাকে একটা স্বতন্ত্র কথনের বয়ান, বিশেষ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির পরিচয়, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেসব সংস্কৃতির গূঢ় তাৎপর্য, ভাষাগত স্বতন্ত্রতা। এর সঙ্গেই থাকে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যা পাঠক-গবেষককে কিছু জিজ্ঞাসার মুখোমুখিও করে। তেমনই কিছু জিজ্ঞাসা থেকে বর্তমান গবেষণাকর্মের উপস্থাপনা। তবে বর্তমান গবেষণা সম্পর্কে অবহিত হবার আগে এই বিষয় সংক্রান্ত যে গবেষণাগুলি লক্ষ করা যায়, সেগুলির উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজন। যেমন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস', মিলনকান্তি বিশ্বাসের 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি', সুবোধ দেব সেনের 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ', শুভাশিস দত্তের 'বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পালাবদল', সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান', রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান' ইত্যাদি।

উপরোক্ত গবেষণাগুলি উল্লেখের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণাকর্মের অভিপ্রায়টি বোঝান সহজ। বলা বাহুল্য, 'লোক' অর্থে কাদের বোঝানো হয়েছে— এমনতর স্পষ্টতা এ গবেষণাকর্মের অন্যতম অভিপ্রায়। কেননা 'ব্রাত্য', 'প্রান্তিক', 'আঞ্চলিক' এবং সে সূত্রে 'লোক' সংক্রান্ত ধারণার সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য বা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সে পার্থক্যের সুস্পষ্টতা এবং সাদৃশ্যের জায়গাটিকে প্রতিভাত করবার একটা প্রয়াস বর্তমান গবেষণায় করা হয়েছে। বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়েছে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিকে। সমাজে ব্যবহৃত এই বাক্‌নির্ভর লোকসংস্কৃতি কীভাবে উপন্যাসে সংযোজিত করে দেওয়া হয়, সে সংযোজন কতখানি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয় উপন্যাসে এবং সমাজে ও সংস্কৃতিতে, এবং উপন্যাসের মাধ্যমে তার তাৎপর্য কি আদৌ অনুধাবন করা সম্ভব— এমন জিজ্ঞাসা

এবং সমস্যার জায়গা থেকেই পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মে অনালোচিত এই বিষয়গুলির জায়গা থেকেই গবেষণার বিষয় স্থিরিকৃত করা হয়েছে— 'নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্ কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য (১৯৫১-২০০০)'।

এই গবেষণায় নির্বাচিত আকর গ্রন্থগুলি হল— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১), মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭), আব্দুল জব্বার এর 'ইলিশমারির চর' (১৯৬১), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' (১৯৭২), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৭৯), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫), অনিল ঘড়াই -এর 'নুনবাড়ি' (১৯৮৯), ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি (১৯৯৩), নলিনী বেরার 'শবর চরিত' (প্রথমপর্ব ১৯৯৮)।

গবেষণাসন্দর্ভটিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার কারণে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া গবেষণা সন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : লোকসংস্কৃতি ও বাংলা উপন্যাস : ইতিহাস ও পরম্পরা— লোকসংস্কৃতি শব্দের উদ্ভব, লোকসংস্কৃতি কী, লোকসংস্কৃতির প্রকারভেদ, এই প্রসঙ্গে বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ও তার প্রকারভেদ এবং সেসঙ্গে গবেষণার মূল লক্ষ্য বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক একটা ধারণা পরিস্ফুট করা। এছাড়া এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের প্রাক্-স্বাধীনতার পর্ব থেকে থেকে শুরু করে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উপন্যাসে বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে— তা এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা উপন্যাসে বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়বৈচিত্র্য— এই অধ্যায়ে গবেষণায় নির্বাচিত উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলির বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা

হয়েছে। আর যেহেতু নির্বাচিত উপন্যাসগুলির প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে লিখিত, তাই স্বাভাবিক কারণেই তা বৈচিত্র্যময়। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে এই সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি তুলনামূলকতার জায়গা তৈরি করা গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: জাতি, ধর্ম ও রাজনীতি— এই অধ্যায়ে 'জাতি', 'ধর্ম', 'বর্ণ' সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে গবেষণার নির্বাচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে জাতিগত, ধর্মীয় এবং রাজনীতিকেন্দ্রিক বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: আর্থসামাজিক চিত্র— চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত উপন্যাসগুলির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষিত হয়েছে এবং উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আর্থ-সামাজিক দিকটিও যে সুগভীরভাবে যুক্ত, তা-ও আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে এবং যুক্তিসম্মতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিক্ষা ও বিনোদন— বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলির পরিবেশনের অন্যতম প্রধান কারণই হল শিক্ষা ও বিনোদন দান করা। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, বাক্‌নির্ভর লোকসংস্কৃতির বিষয় সবসময় আনন্দ নির্ভর হয় না। কেননা সুখ ব্যতীত দুঃখ-হতাশা-দুর্দশা-দুরবস্থার চিত্রও এতে প্রকাশিত। তাহলে তা কীভাবে আনন্দদায়ক অর্থাৎ বিনোদনমূলক? সেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির যে বিনোদনের দিকটিকে আলোচনা করা হয়েছে তাতে অ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিসের তত্ত্বটিকেও প্রয়োগ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ভাষাবৈচিত্র্য— ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাকে পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে গবেষণার সামগ্রিকতাকে বজায় রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ভাষাবৈচিত্র্য পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তার তাৎপর্য অনুধাবনের জায়গাটিও পরিস্ফুট হয়েছে, যা এ গবেষণার অভিমুখের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

সপ্তম অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিল্পমূল্য— সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসে যে সমস্ত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ ঘটেছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? সেগুলি কি উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে আদৌ প্রাসঙ্গিক হয়েছে? বাক্‌নির্ভর উপাদানগুলিই কি সে সকল উপন্যাসের মুখ্য উপাদান— এসব যাবতীয় জিজ্ঞাসাসূত্রে শিল্পমূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ শতকের তিরিশের দশক এক্ষেত্রে আপাত অপ্রাসঙ্গিক হলেও, বলতে হয় মার্কসবাদ, সাম্যবাদের ধারণা বদলে দিয়েছিল কল্লোলের লেখাজোখা। যে কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন 'পাঁক' এর মত উপন্যাস, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখেন 'বেদে', আবার মণীশ ঘটক লেখেন 'পটল ডাঙার পাঁচালী'র মত উপন্যাস। যদিও মার্কসবাদের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ধারণা দূরতর মনে হতে পারে, অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে। তবুও একথা স্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্য প্রকাশ করছিল অন্যতর একটা জীবনকে, অন্যরকম একটা সংস্কৃতিকে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তাই সমালোচকের কথায় 'ভানুমতীর ভেল্‌কি'। এই বিশেষ রকমের জীবন-যাপন স্বাধীনতার পরে আরও বিশেষভাবে বিশেষায়িত হল। সংস্কৃতির স্তর থেকে স্তরান্তরের যে পরত তা প্রকাশিত হল অসংখ্য বাংলা উপন্যাসে, তারই কিছু প্রতিফলন রয়েছে উপরোক্ত নির্বাচনের তালিকায়। আর সময়ের আবর্তকে গবেষণার সুসংহতি এবং যথার্থ করে তুলবার কারণে বেঁধে দেওয়া হয়েছে— ১৯৫১-২০০০।

সমগ্র বিষয়খানিই সমুদ্রসম। এর যথাযথ নির্মাণের যে প্রচেষ্টা, তার অন্তরালে রয়েছেন এ গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. মোস্তাক আহমেদ। স্যারের নিরন্তর তাগিদ এ গবেষণার অগ্রগতির অন্যতম কারণ। তিনি আন্তরিক তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়ে এ গবেষণাকে পরিপাট্য, পরিমার্জিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। তাঁর নির্দেশনা আমার আগামী দিনের পাথেয় হয়ে রইল। এছাড়াও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য স্যারেরাও এ গবেষণা কে সাহায্য করেছেন অনেকভাবে।

স্যারের তত্ত্বাবধান ব্যতীতও বিভিন্ন লাইব্রেরি এ গবেষণার সহায়ক। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লাইব্রেরি,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ‘লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র’, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজিট্যাল পাবলিক লাইব্রেরি এ গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। সকলের কাছেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে গবেষণার সূত্রপাত করা হল।

প্রথম অধ্যায়:

লোকসংস্কৃতি ও বাংলা উপন্যাস: ইতিহাস ও পরম্পরা

লোকসংস্কৃতি নামক বিষয়টি বর্তমানে বহু চর্চিত হলেও এর পথচলা অতি পুরানো। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে William John Thomas প্রথম 'Folklore' শব্দটি লণ্ডনে 'The Athenaeum' পত্রিকায় প্রবর্তন করেন। এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি শব্দটির ব্যবহার। 'ফোকলোর' শব্দটি উদ্ভাবনের পেছনে জার্মান 'Volks kunde' শব্দটির প্রেরণা ছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কারণ জার্মান পণ্ডিতগণ 'ফোকলোর' এর বহু পূর্ব থেকেই অনুরূপ অর্থে 'ভোকস্কুণ্ডে' শব্দটি ব্যবহার করে আসছিলেন। 'ফোকলোর' শব্দটি প্রচলিত হবার পরে 'ভোকস্কুণ্ডে' শব্দটির ব্যবহার একেবারে কমে আসে। এবং 'ফোকলোর' শব্দটি গোটা বিশ্বে চলিত হয়।

'লোকসংস্কৃতি'র 'লোক' বলতে একটি বিশেষ লোকসমাজকে চিহ্নিত করে। লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি শাখা হল লোকসাহিত্য। যা কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সাহিত্য নয়। সমালোচকের অভিমত, তা 'সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি'। এই 'সংহত সমাজ' এর লোকেরা সমাজতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যায় সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক জনসমাজ। এ সমাজ নিরক্ষর, নিজস্ব সংস্কারে পূর্ণ, স্বকীয় বিশ্বাসে সভ্য সমাজের মূল স্রোত থেকে একটি বিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে অবস্থান করেছে এবং করছে বরাবর। এমনতর বিশেষ একটি সমাজের একইরকম ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে যে জীবনচর্চা এবং চর্যা, অর্থাৎ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, শিল্পকলা ইত্যাদি যে বিষয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে তার সবটাই লোকসংস্কৃতির আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়। লোকসংস্কৃতি প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বাস-প্রথা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে বয়ে চলে। সমালোচকের মন্তব্য—'হস্তগত হয় মুখে মুখে, আচার ব্যবহারের মারফৎ কিংবা আয়ত্ত করতে হয় চেষ্টাপ্রসূত অনুসরণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে।'[১]

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে ফোকলোর অর্থে মৌখিক ধারার সাহিত্যকে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ 'Verbal Art' বা 'Oral Literature' বা অলিখিত সাহিত্যকেই লোকসংস্কৃতি বলে নির্দেশ করে।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান শাখা হল বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। এই পর্যায়ের বিষয়গুলি মৌখিকভাবে সৃষ্ট হয়ে মুখে মুখেই জীবিত থাকে। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির— '...জন্ম যেমন মুখে মুখে, পূর্ববর্তী সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে, এক দেশ বা সমাজ থেকে অন্য দেশে বা সমাজে তার প্রচারও তেমনি মুখে মুখেই হয়ে থাকে।"[২] বলা বাহুল্য, বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে লোকসাহিত্যকেই চিহ্নিত করে। এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলি দীর্ঘসময় কালের লোকপরম্পরায় লালিত। মুখে মুখে উদ্ভাবিত এবং বংশপরম্পরায় বাহিত হবার ফলে সময় উপযোগী হয়ে ওঠে। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সে 'Verbal Art' অনেক সময় লিখিত আকার ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়—

"মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পর এই শ্রেণীর লোক ঐতিহ্যের অনেকাংশে লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে কালের ব্যবধানে লিখিত সাহিত্যের বহু অংশেও মৌখিক ঐতিহ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে সেগুলি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।"[৩]

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিক অক্ষরজ্ঞানহীন বা স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি। তা মূলত মৌখিক সৃষ্টি। শ্রুতিনির্ভর এবং স্মৃতিবাহিত শিল্প। লোকসমাজে বহুল প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, মিথ, লোককথা, গীতিকা, কিংবদন্তি প্রভৃতি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

এত গেল লোকসংস্কৃতির কথা। এবার আমাদের আলোচনার বিষয় 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এ বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদান লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ সাধনসঙ্গীরা হেঁয়ালির আশ্রয়ে তাদের ধর্মের কথা লুকিয়ে রেখেছেন এই গ্রন্থে। সঙ্গে বলে

নেওয়া প্রয়োজন ‘চর্যাপদ’ এ বর্তমান যুগের মতো ধাঁধা প্রয়োগ করা হয়নি। বলা চলে তা সম্ভবও ছিল না।

প্রবাদ লোকসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ‘চর্যাপদ’ এ ব্যবহৃত প্রবাদ আজও লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। তার আবেদন আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। চর্যাপদের ৬ নং শ্লোকে এই রকমই একটা প্রবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়—

‘আপনা মাংসেঁ হরিনা বৈরী।’[৫]

এইরকম কয়েকটি প্রবাদ চর্যাপদের অন্যান্য পদে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

‘হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী’ [৬]

‘রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ’ [৭]

এত গেল প্রাচীন যুগের একমাত্র লিখিত সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ এর বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-সংস্কৃতির কথা। এবার মধ্যযুগের সর্বপ্রথম নিদর্শন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে উঁকি দিয়ে তার মধ্যে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির খোঁজ করা যেতে পারে। এই কাব্যে অসংখ্য প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। ‘দানখণ্ড’- এ ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ হল—

‘ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ’[৮]

‘জনম গেল করমের খঅ’[৯]

‘দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে।’[১০]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের আলোয় আলোকিত। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশো বছর ধরে এই কাব্যগুলির রচনাধারা সচল থাকলেও মূলত মধ্যযুগেই মঙ্গলকাব্যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই মঙ্গলকাব্যে বাঙালির লোক-ঐতিহ্যের জীবন্ত দলিল। এই ‘মঙ্গলকাব্যে’ বহু ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, মিথ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত দেখতে পাওয়া যায়। এই রকমই দুটি প্রবাদ হল—

‘পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।’[১১]

বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।।'[১২]

বাংলা মঙ্গলকাব্যের একজন অন্যতম রচয়িতা হলেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি নন, তিনি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও বেশ কিছু বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বাংলা উপন্যাসের জন্ম ঔপনিবেশিক সময় এবং সমাজে এবং সেটি ইংরেজি 'নভেল' এর অনুকরণে তার জন্ম। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এই উপন্যাসের ধারণাটি বিদেশি হলেও বাংলা সাহিত্যে গল্প বলার ধারণা বহু পুরানো। এই বৈশিষ্ট্য শুধু বাঙালি নয় গোটা বিশ্ববাসীর মজ্জাগত। সমালোচকের কথায় তাই বলতে হয়—

"উপন্যাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই গল্প কাহিনীর এই দুটি ধারা মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যে বর্তমান ছিল। এর থেকে প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করে পরবর্তী যুগের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সব গল্প কাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলির রূপান্তর সাধন করেই পৃথিবীর সব দেশেই আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব। মানুষ যখন কেবলমাত্র শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, যখন সে নিজস্ব তাৎপর্য ও পরিচিতিতে প্রতিহত তখনই তার বিচিত্র জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে।'[১৩]

সাহিত্য বহতা নদীর মতো। কখনো এক জায়গায় থমকে থাকে না। বিভিন্ন সময়ে তার চলার পথে বাঁক আসে। তাই বাংলা উপন্যাস তার শতাব্দীব্যাপী পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বাক্ এসেছে। এসেছে নতুনত্ব। তাই কখনো রবীন্দ্রনাথের হাতে 'আঁতের কথা' যেমন জায়গা করে নিয়েছে তেমনি আবার ত্রৈলোক্যনাথের হাতে ঔপনিবেশিক সমাজ ও কল্পনা সংবেলিত ভৌতিক ও মানবীয় ঘটনার অবতারণা ঘটেছে। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কাহার সমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য আমরা দেখেছি। আমরা এই পর্বে আলোচনা করব

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি উপাদান। এই বিষয়কে সামনে রেখে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া যাওয়া হবে।

তথ্যসুত্র:

১. মযহারুল ইসলাম, 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যে পঠন-পাঠন', ২য় সং, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ ১১

২. তদেব, পৃ ১৩

৩. ড. তনিমা চক্রবর্তী, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোকঐতিহ্য', দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ৩ জুলাই ২০১১, পৃ ১৩

৪. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ' চর্যাগীতির ভূমিকা', পুনর্মুদ্রণ , কলকাতা, ডি .এম লাইব্রেরি, ২০০৫, পৃ ২০৭

৫. তদেব, পৃ ২১৬

৬. তদেব, পৃ ২০৫

৭. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', নবম সংস্করণ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং ২০০২, পৃ ২০৬

৮ . তদেব

৯. তদেব, পৃ ২১০

১০. সুখময় মুখপাধ্যায়(সম্পা), 'কবিকঙ্কন জীবন রসিক মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' (প্রথম খণ্ড), পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়, জুলাই ২০০৬, পৃ ৮১

১১. তদেব

১২. ড.সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান', 'সূচনা অংশ' , প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ ০২

দ্বিতীয় অধ্যায়:

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিষয়বৈচিত্র্য

আমাদের এই গবেষণার দুটি বিষয়। একটি হল বাংলা উপন্যাস এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হল বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি বিষয়টি উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আর উপন্যাস সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা। কখনো কখনো এই দুটি ভিন্ন শিল্পমাধ্যম নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত হতে পারে বা মিশ্রিত হতে পারে। বাংলা উপন্যাসে এমন কিছু উপন্যাস আমরা পায় যেখানে লোকসংস্কৃতি বা লোকায়ত জীবন তাতে উঠে আসতে দেখা গেছে। ঐ বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলিতে অঞ্চল একটি বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' যে প্রেক্ষাপট বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বা নলিনী বেরার 'শবর চরিত' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এক নয়। গবেষণার আলোচিত উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট বা ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। তাই সমালোচক বলেন—

'আমরা জানি প্রবাদ লোকজীবন ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ, যার পূর্ণাঙ্গরূপ বহুলাংশে আঞ্চলিকতার মধ্যে লালিত। অঞ্চল বিশেষের ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পটভূমি, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্য নিয়ে বিশিষ্ট এক একটা অঞ্চল গড়ে ওঠে তার ফলে অঞ্চল বিশেষের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সমাজ-অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়, এবং তার প্রতিফলন ঘটে-বস্তু উপকরণ, ভাব-ভাবনাও জীবনাচারের বহু বিচিত্র ধারায়। উন্নত কেন্দ্র বহির্ভূত প্রান্তীয় সাংস্কৃতির ধারাতেও জাতীয় সংস্কৃতি প্রবাহমান।'[১]

প্রসঙ্গত বলতে হয় সমালোচক এখানে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ প্রবাদের কথা বললেও এর প্রাসঙ্গিকতা সমগ্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক তা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। কেননা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ বা আবহাওয়া বা অঞ্চলনির্দিষ্ট কালচার তৈরি

করে। সেই কারণে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের তারাশঙ্কর যে বেদে জীবন দেখান হয় সেটা কখনই 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে দেখা যায় না। তাই বলা যায় দক্ষিণবঙ্গের পরিবেশ ও ভূগোল অনুযায়ী ঐ অঞ্চলে পৃথক একটি সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ অঞ্চল ও ভৌগোলিক কারণে বা দূরত্বের জন্য একি ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভেদ দেখা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. সুশীলকুমার দে, 'বাংলা প্রবাদ', 'তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন' পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড; ১৩৯২, পৃ ০৪

তৃতীয় অধ্যায়:

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: জাতি,ধর্ম ও রাজনীতি

'সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে, জাতের কি রূপ, দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তসবী গলে
তাইত রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কাররে।' (লালন ফকির)

ভারত তথা গোটা বিশ্ব জাতি, ধর্ম, রাজনীতি, সাদা-কালো প্রভৃতি নিয়ে মানুষ মানুষের উপর হানাহানি, রক্তপাতে ব্যস্ত। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে হত্যা করে ধর্মীয় তক্‌মার বশবর্তী হয়ে। আমাদের কাছে ধর্মের শিলমোহরই যথেষ্ট অন্য একজন মানুষকে বা একটি

জাতিকে মারার কিংবা ভালোবাসার জন্য। মানুষের বড়ো পরিচয় যে সে একজন মানুষ—এ কথা আমরা প্রায় অনায়াসে ভুলে থাকি।

আমাদের সমাজে কার কোন জাত— সে প্রশ্নের সত্যিই কী মানে আছে ? কেননা জাত বা ধর্ম আমরা নিজে চাক্ষুস করতে পারি না। জাতের নির্দিষ্ট কোন চিহ্ন বোধ করি থাকে না। কেননা সুন্নত দিলে যদি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায়, কিংবা পৈতে পরিধান করলে যদি ব্রাহ্মণ হয়ে যায়, তাহলে তাদের স্ত্রীদের বেলায় কী হবে ?

আমাদের ভাবায় যে, আমরা জন্ম নেবার সময় বিশেষ কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের শিলমোহর এঁটে ভূমিষ্ঠ হয় না। আমরা সবাই প্রায় একইভাবে জন্মাই। জন্মের পর পোষাক, সংস্কার, রীতি খাদ্যাভাসের মধ্যে দিয়ে আমরা এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের চাইতে পৃথক দেখাতে উৎসুক হই। আসলে সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের মধ্যে উঁচু নিচু, ধনী-গরীব, হিন্দু-মুসলমান, সাদা-কালো, চামার-মুচি, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভৃতি তক্‌মা এটে দেয়। আদতে জাত, বেজাত বলে কোন কিছু সত্যিই কী মানুষের মধ্যে থাকে ? মানুষের মধ্যে তাঁর মনুষত্বই বড়ো নয় কী ? কিন্তু এটাই সত্যি যে আমাদের সমাজে তথা গোটা বিশ্বে এই জাতি, ধর্ম বর্তমান, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। জাতি ধর্ম প্রথায় আমরা গভীর বন্ধনে আবিষ্ট হয়ে আছি অধঃপাতে গেছি, এতটাই অধঃপাতে গেছি যে, এই প্রথাকে ধর্মের অজুহাতে সেটা বিধিসম্মত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাই।

বাংলা 'জাতি' শব্দটি ইংরেজি 'Caste' শব্দ থেকে আগত। এই ল্যাটিন শব্দ 'Castus' থেকে এটি গৃহীত। এর অর্থ হল শুদ্ধ। ভারতীয় সমাজে এই 'Caste' শব্দটি পর্তুগীজদের দ্বারাই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল যে 'caste' শব্দটি রক্তের শুদ্ধতা রক্ষার তাগিদেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'জাতি' সম্পর্কিত ধারণাটি খুবই জটিল একটি বিষয়। 'জাতি' ও 'বর্ণ' দুটি আলাদা জিনিস। বৈদিক যুগে চার বর্ণের শ্রেণি বিভাজন করা হয়।এই চতুর্বিধ থেকে অসংখ্য গোষ্ঠীই জাতির মর্যাদা লাভ করে। কৃতযুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। আবার সত্যযুগে মানুষেরা একই জাতিভুক্ত ছিল। পরে গুণ ও কর্মবিচার করে জাতিভেদ তৈরি হয়।

আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসে দেবতার মুখ, বাহু, জানু ও পদ থেকে উদ্ভুত হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বিষয়ে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে ৯০তম সূক্তে তার হদিশ মেলে। ব্রাহ্মণের জন্ম হয় দেবতার মুখ থেকে, দেবতার বাহু থেকে জন্ম হয় ক্ষত্রিয়, উরু থেকে জন্ম হয় বৈশ্যের এবং দেবতার চরণ থেকে জন্ম হয় শুদ্রের। ঋক্‌বেদের এই সূক্তি থেকেই সমাজে শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তারা সমাজে অবহেলিত, দরিদ্র এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

গবেষণায় নির্বাচিত উপন্যাস ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’তে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মনসামঙ্গলের কাহিনির সঙ্গে নিজস্ব কিছু ভাবনার মিশ্রণ ঘটিয়ে উপন্যাসের নতুন রূপ দেন। এই কাহিনিতে চাঁদ সওদাগর যেমন ছয়পত্র সহ ধনসম্পত্তি হারায় তেমনি বিষবৈদ্যদের শিরবৈদ্যর একমাত্র কন্যা মৃত্যু হয়। শিরবৈদ্যের ছড়ানো বিষই মারা গেল তার মেয়ে—

‘তুমি পুঁতলে বিষ-বিরিক্ষি ফল খাইবে কে ?
মরুক মরুক চাঁডো বেনে মণ্ডে পড়ুক বাজ গ !
অ-গ
এত দেবতা থাকতে হৈল মনসার সঙ্গে বাদ গ !
অ-গ’ [১]

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যেরও একটি সাধারণ বিষয় হল স্বর্গের শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী নিজের মহিমা প্রচারের জন্য মর্তে এসে পুজো প্রচারে করা। অপেক্ষাকৃত নিম্নসমাজে এবং নারীসমাজে মনসার পূজা অল্পবিস্তর প্রচলিত থাকলেও সমাজের উচ্চস্তরে সে ছিল অপূজিত, অপ্রচলিত এবং অবহেলিত। সমাজের সর্বস্তরে পুজো পেতে গেলে মনসার প্রয়োজন ছিল বণিক জাতি তথা চাঁদ সওদাগরকে। এর কারণ চাঁদ সওদাগর সেই সময় সমাজে উচ্চসম্প্রদায়ের মানুষ তাই তিনি মনসাকে পুজো করলে সমাজের সাধারণ মানুষ তাকে অনায়াসে অনুসরণ করে মনসাকে পুজো করবে। কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর মনসাকে পুজো করতে অরাজি। এই বিষয়টি এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিতে ধরা পড়েছে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে লখিন্দরের বাসর ঘরের পেছনে ঘোরতর রাজনীতি রয়েছে। এবং চাঁদ সওদাগরের মনসার পুজো দেওয়ার মধ্যে জাতিগত চেতনা কাজ করেছে। একজন মেয়েকে পুজো দেওয়ার মধ্যে চাঁদ সওদাগরের পৌরুষত্ব ও জাতিগত অহং-দুই ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে লোহার বাসর ঘরে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। চাঁদ সওদাগর এই ঘটনার জন্য শিরবৈদ্যকে দোষারোপ করে। কেননা তার উপরই লখিন্দরের তথা সাঁতালি পাহাড়ের রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই চাঁদ সওদাগর শিরবৈদ্যকে নেমকহারাম বলে গালিগালাজ করে। অন্যদিকে বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভাসবেন বলে স্থির করে—

'জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা
হায় গ ! হায় গ !
কঠিন নাগিনী তোর দয়া হ'লো না !
হায় গ ! হায় গ !' [২]

আমাদের সমাজ সমস্ত কিছু খারাপের পেছনে মেয়েদের দায় দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। মনসা ও চাঁদ সওদাগরের সংঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। বলা যেতে পারে রাজনৈতিকভাবে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। কিন্তু সমাজ এর মৃত্যুর পেছনে সদ্য বিধবা হওয়া বেহুলাকে অপয়া বলে চিহ্নিত করে দায়ী করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ ১৮

২. তদেব , পৃ ২৫

চতুর্থ অধ্যায়:

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: আর্থ-সামাজিক চিত্র

সাহিত্যের জগতে উপন্যাস আধুনিককালের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যে উপন্যাস নামক এই সংরূপ আধুনিক কালের সমৃদ্ধতর শাখা। উপন্যাস বাস্তবনির্ভর, জীবন নির্ভর শিল্পকর্ম বলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় এটি জীবনকে ভিন্নভাবে রূপায়িত করে। যা আর সাহিত্যের অন্য কোনো শাখায় পাওয়া যায় না। আমরা এই অধ্যায়ে নির্বাচিত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিতে আর্থ-সামাজিক চিত্রগুলি খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

গবেষণায় নির্বাচিত আবু ইসহাক এর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কারণে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া মানুষের বাঁচবার প্রত্যাশা নিয়ে গ্রামে-শহরে ছোটাছুটি প্রাণান্ত প্রচেষ্টার এক বেদনাবিধুর কথা চিত্র এই উপন্যাস। এবং কুসংস্কারের কবলে থাকা আমাদের গ্রামীণ জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই উপন্যাসে। অভাবের সংসারে হাসু তার বোনের জন্য চুড়ি কিনে আনলে মা জয়গুন প্রবাদ কেটে বলে—

'খাইতে নাই হুইতে রাঙ্গা পাদি'।[১]

জয়গুনের অন্যপক্ষের ছেলে কাসু। জয়গুনের প্রথম পক্ষে স্বামী জব্বর। তার মৃত্যুর পর করিমবক্‌শের সঙ্গে জয়গুনের পুনরায় বিয়ে হয়। দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে সে জয়গুনকে তালাক দেয়। এই প্রসঙ্গে সমাজের গভীর সত্যভাবনা ছড়ায় প্রয়োগে দেখা দেয়—

'পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।'[২]

এই মানসিকতা আমাদের সমাজে সর্বদা চোখে পড়ে। মেয়েকে বোঝা ছাড়া অন্যকিছু ভাবে না আমাদের সমাজে। আবার পুত্রসন্তানদের বেলায় এর বিপরীত ছবি চোখে পড়ে। সমাজের এই পুরুষ ও মহিলার বিভাজনের কারণেই আমদের সমাজ আজ এত পিছিয়ে। সমাজের চোখে কন্যা সন্তান শুধু কুলের দাগ হয়েই বয়ে গেল, 'বংশের চেরাগ' হওয়া হল না তাদের।

সামাজিক বাধানিষেধে নারী সব সময় জর্জরিত। এই বাধায় আসলে নারীকে পুরুষের হাতের পুতুল করার অভিপ্রায়। তাই জয়গুনের মতো খেটে খাওয়া মেয়েকে এই কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। যাতে করে জয়গুন বাধ্য হয়ে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারে এবং পুরুষের ভোগের বস্তু হয় উঠতে পারে। জয়গুনের আর্থিক অবস্থা খুবই মন্দ। তার উপর সমাজ তাকে 'তত্তবা' করেছে। তার ফলে বাইরে গিয়ে নিজেও রোজগার করতে পারে না সে। সমাজ তাকে এই বিষয়ে অনুমতি দেবে না বা দেয় না। কিন্তু জয়গুন ঘর থেকে না বের হলে চারজন

ছেলে মেয়ে নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তাই সে শেষমেষ স্থির করে বাড়ির বাইরে কাজ করতে বের হবেই। জয়গুণের গ্রামের বান্ধবি লালুর মা তাই গান ধরে—

'আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর‍্যা দোর।'[৩]

এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিতে লালুর মা বলতে চেয়েছে মানুষের হাত-পা থাকার সত্ত্বেও সমাজের কুশাসনে সেই সুস্থ সবল মানুষ নাখেতে পেয়ে মারা যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. আবু ইসহাক, 'সূর্য দীঘল বাড়ী', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, এপ্রিল ২০১২, পৃ ১৮
২. তদেব, পৃ ২০
৩. তদেব, পৃ ১২০

পঞ্চম অধ্যায়:

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিক্ষা ও বিনোদন

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়েছে খাদ্যের। সেই খাদ্যের তাগিদে নির্ভর করতে হয়েছে প্রকৃতির উপর। যেহেতু মানুষ তখন ছিল দলবদ্ধ, তাই খাবারের যোগানও বেশি দরকার হত। এবং খাদ্যের প্রয়োজনে প্রতি মুহূর্তে তাদের ছিল যাযাবরের জীবন-যাপন। এই খাদ্যের সঙ্গেই মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্য দুটি ছিল— বস্ত্র এবং বাসস্থান। গাছের বাকল বা পাতা বস্ত্রের প্রাথমিক

প্রয়োজনটুকু মেটায়। আর জন্তু জানোয়ার ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে তখন অন্যতম আশ্রয় ছিল গুহা। আর এই গুহার দেওয়ালেই আদিম মানুষের অবসর বিনোদনের প্রথম প্রকাশ ফুটে ওঠে বিভিন্ন চিত্রে। চিত্রগুলির মধ্যে কালক্রমে রং-এর ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শিতা পরিস্ফুট হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই চিত্রাঙ্কন প্রক্রিয়াই আদিমতম মানুষের একটি বিশেষ বিনোদনের প্রচেষ্টা।

যে-কোনো জাতির আনন্দ বা স্ফূর্তির বহিঃপ্রকাশ ক্রীড়া-কৌতুক ও নৃত্য গীতের মধ্য দিয়ে। এই ব্যাপারে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলে আমোদ বা বিনোদনের অংশীদার। অঞ্চল ভেদে এই বিনোদনের তফাৎ দেখা গেলেও এর যে মূল সুর তা কিন্তু একই থাকে। এই বিনোদন সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন জুড়ে গেছে, তেমনি আবার অনেক সামাজিক প্রথার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। তাই বেশ কিছু সামাজিক প্রথা বা আচার আজ বিনোদনেরই মাধ্যম। জাতি, ধর্ম, সমাজ, অর্থ প্রভৃতি ভেদে বিনোদনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। এবং কালপটের পরিবর্তন বিনোদনের পরিবর্তনের অন্যতম কারণও বটে। তাই প্রাচীন কালে বিনোদনের যে চেহারা তা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। একথা এতখানি দাবির সাথে বলবার কারণ লোকজীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা বিভিন্ন বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলির (ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র প্রভৃতি) প্রচলন। এ সকল বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যগুলি আজও ঐতিহ্য এবং পরম্পরাকে বহন করে চলেছে। ধারণ করে রয়েছে ভাষার আদিমতাকে, সংস্কৃতির শেকড়কে। আর এসবের পাশাপাশি এ সকল উপাদানগুলি মানুষের সংস্কৃতির পরম্পরাকে বহন করবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তন এবং মননশীলতার একটা জায়গা তৈরি করেছে। সর্বোপরি এ চর্চা হয়ে উঠেছে বিনোদনের অন্যতম অংশ। যদিও বিশ্বায়নের কারণে বিনোদনের মধ্যে আজ আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও গান, নৃত্য-গীত, গল্প-গাছা, প্রবাদের ব্যবহার, ধাঁধার উপস্থাপন, লোকক্রীড়া ইত্যাদি নানা মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং বিনোদনের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এ সকল বিনোদনে একাধারে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সঙ্গে রসবোধের দিকটিও উন্মোচিত হয়।

বর্তমান আলোচনার বিষয় বাংলা উপন্যাস এমন সব উপাদানের যথাযথ ব্যবহারে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যময়তা এনেছে, যেখানে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি

নিছক কোনো আখ্যানের উপকরণ হিসেবেই নয়, তার যে বিশেষ গুরুত্ব সেই দিকটিকেও তুলে ধরেছে। যেমন— তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে বেদে সমাজের ব্যবহৃত যেসব বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি উপস্থাপিত হয়েছে, সেসব উপন্যাসটির আঞ্চলিকতাকে বুঝতে এবং সে অঞ্চলের বেদে গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বিশ্বস্ত করে তুলতে ভীষণরকম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আর তাতে ধরা পড়েছে শিক্ষা এবং বিনোদনমূলকতার জায়গাটিও।

বৈদ্যরা লখিন্দরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে না পারায় চাঁদসওদাগর তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। তারপর বিষবৈদ্যরা হাঙরমুখী বাঁকে এসে উপস্থিত হয় সেখানে এলাকার মানুষের ঢাকির বাজনা সহযোগে গান করে—

'লাচো লাচো আমার কালনাগিনী কন্যে গ !
অ-গ !
দুস্কু আমার সোনা হইল তু মানিকের জন্যে গ !
অ-গ !
কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ !
অ-গ !
কালীদহে কালনাগিনী উঠল জলে ভাসি গ !
অ-গ !
মোহন বংশীধারীর আমার লয়ন মন ভরে গো !
অ-গ !' [১]

ভাদ্রমাসের শেষ নাগপঞ্চমীতে বিষবেদেরা বিষহরির আরাধনা করে। এই উৎসবই ওদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। বিষহরির আঙিনাতে সেই উৎসব পালন করা হয়। গোটা পাড়ার লোক গানের আসরে উপস্থিত হয়।

শবলা নাগিনী কন্যার পরে পিঙলা তাদের সমাজে নাগিনী কন্যা হয়। পিঙলা একদিন মন খারাপ করে বিলের ধারে বসে থাকতে থাকতে একসময় 'বাঘা' তথা বাঘ এর আগমন ঘটে। সেই সময় পিঙলা সেই 'বাঘা' কে উদ্দেশ্য করে প্রেমালাপ করে এবং গান ধরে—

'বঁধু তুমি, আইলা যোগীর ব্যাশে ।

হায় –অবশ্যাষে !

. . . . .

চাঁচল চুলে জট বাঁধিছ লয়ানে নেই কাজল–

অধরে নাই হাসির ছটা—চক্ষে ধরে বাদল।' [২]

বেদেরা একটি বিশেষ দিনে সমারোহের সঙ্গে উৎসব পালন করে। তারা অনেক কৌশল করে বাঘ মারে। সেই শিকারে খরগোশ, সজারু, তিতির, বাঘ প্রভৃতি প্রাণী শিকার করে। বাঘের মাংস তারা পেঁয়াজ, রসুন, মসুর প্রভৃতি সহযোগে রান্না করে। আর বাঘের চামড়া বিষহরির থানে পাতা হয়। এই প্রসঙ্গে যে লোকসঙ্গীতের প্রয়োগ করা হয়েছে, তা বিনোদনেরই প্রকাশ—

'জয় বিষহরি গ ! জয় বিষহরি গ !

সকল দুস্ক হইতে মোরা তুমার কৃপায় তরি গ !

অ-গ !' [৩]

এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাদের উৎসবের সূচনা হয়। বাজতে থাকে নাকড়া, বিষমঢাকি, তুমড়ী-বাঁশী, চিমটের কড়া বাদ্য।

'বেদে' সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বলে তাদের পরিবারের মেয়েরা পাড়ায় বাঁদরের নাচ দেখিয়ে গান শুনিয়ে অর্থ উপার্জন করে। তাদের বাঁদরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বিনোদনের মাধ্যমে দর্শকের মনোরঞ্জন করে টাকা আদায় করে। আর বেদেনীরা উপস্থিত দর্শকের উদ্দেশ্যে গান ধরে—

' যেমন বাবুর চাঁদো মুখো

তেমনি বিদায় পাব গ।

বেনারসীর শাড়ি পর্‌য়া

লেচে লেচে যাব গো !

. . . . .

দিব প্রভুর জয় গ !’ [৪]

বিনোদন হল কর্মক্লান্ত জীবন থেকে শরীর ও মনকে সরিয়ে নির্মল আনন্দ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অন্যত্র প্রেরণ করা। অর্থাৎ মনতুষ্টিকর বিষয়ের মধ্যে প্রেরণ করাকে বিনোদন বলা যায়। সমাজের সব স্তরের মানুষ সব বয়সের মানুষ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা করে নেয়। মানবজীবনে এই বিনোদন স্বাস্থ্যরক্ষার বিকল্প ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি এ উপন্যাসের চরিত্রেরাও খুঁজে নেয় সেই আর্থিক সমস্যা জর্জরিত জীবনের বাইরেও বিনোদনকে। আর সে বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে তাদের গান। আর তাতে নিহিত থাকে তাদের কথ্যভাষা। আর সেসব কথ্যভাষার সূত্র ধরে খুঁজে দেখা যায় মান্য ভাষার শেকড়কে।

এ আলোচনার অন্তর্গত মনোজ বসুর ‘জলজঙ্গল’ উপন্যাসটিতেও দেখা যায় উপন্যাসের চরিত্র পদ্ম, উমেশকে ‘রাবণ বধ’ পালার গান করতে অনুরোধ করলে, উমেশ গান ধরে—

‘কও দেখি হে লঙ্কাপতি,

রাম কি বস্তু স্বাধারণ ?

রামের সীতে রামকে দিয়ে হইগে গিয়ে শরণাপণ’ [৫]

তবে বিনোদন শুধু এককভাবেই উপভোগ্যের বিষয় হবে এমন নয়। বরং, বিনোদনের একটা বিরাট জায়গা এই যে, একাধিক মানুষের সম্মিলন। যেমন যিনি যাত্রা করছেন এবং যাঁরা তা শুনছেন উভয় পক্ষই বিনোদনে অংশগ্রহণ করেছেন। আবার গ্রামের মানুষের বিভিন্ন প্রকার বিনোদনের মধ্যে লোকদেবতা কেন্দ্রিক পালাগান বিশেষ আগ্রহের। বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের মানুষ এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পালা যেমন— দক্ষিণার পালা, পঞ্চানন্দ, বেনাকি, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, দুর্গা, বনবিবি, ওলাবিবি, নয়বিবি, মানিক পীর, বর পীর সাহেব, সত্যপীর প্রভৃতি পালা। বছরভরই উল্লিখিত দেবদেবীর পূজাচার এবং পালাগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর লক্ষণীয় উপরোক্ত সমস্ত সঙ্গীতের যে বিষয় তার বেশিরভাগটাই পুরাণ সম্পৃক্ত। লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার থেকে উদ্ভূত দেবী-দেবতা সংক্রান্ত ভাবনাটিও এক্ষেত্রে পরিস্ফুট।

তথ্যসূত্র:

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় , 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' অষ্টম মুদ্রণ , কলকাতা, প্রকাশ ভবন , এপ্রিল ২০১৩ ,পৃ ২৮

২. তদেব ,পৃ ৯৪

৩. তদেব

৪. তদেব , পৃ ৪৩

৫. মনোজ বসু, 'জলজঙ্গল', নতুন মুদ্রণ, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ ১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়:

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক ভাষাবৈচিত্র্য

আদিম জীবন থেকে সভ্যতার দিকে পা বাড়ানোর ক্ষেত্রে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের পাশাপাশি আরও একটি জিনিস এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল তা হল 'ভাষা'। এই ভাষাই মানুষ আর পশুতে ফারাক ঘটাল। ভাষা প্রকাশ করল মানুষের চিন্তাকে, চেতনাকে। আর সে প্রকাশই রূপ পেতে থাকল ব্যবহারিক জীবনযাত্রায়। ভাষার সৃষ্টি মানুষকে সভ্যতার পথে বহুযোজন মাইল এগিয়ে দিতে পেরেছিল। সভ্যতার সংস্পর্শে সে ভাষায় লেগেছে নানা পলেস্তারা। বিভিন্ন তার রূপ। বর্তমান ভাষার সঙ্গে আদিম ভাষার বহুযোজনের ফারাক বোঝা তো আজ দুঃসাধ্য। তবে লোকসংস্কৃতি আজও হয়তো সে ভাষার সাক্ষ্য বহন করে। লোকসংস্কৃতির আয়ত্তাধীন কিছু ভাষা আজও সভ্যতা এবং ঐতিহ্য ও পরম্পরার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তারই প্রমাণস্বরূপ এ অধ্যায়ের আলোচনা।

ভাষার মূল ভিত্তি হল ধ্বনি। বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে সেই ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এক ভাষাভাষি ভূখণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক মৃণাল নাথ তাঁর 'ভাষা ও সমাজ' নামক গ্রন্থে তাই বলেন— 'বহুবিধ কারণে বা হেতুর জন্য ভাষায় রূপভিন্নতা দেখা দেয়— ... অঞ্চলভেদের জন্য উপভাষার সৃষ্টি হয়। সামাজিক শ্রেণীর ভেদে ভাষায় ভিন্নতা দেখা যায়। নৃগোষ্ঠীর জন্যও ভাষায় যেমন ভেদ হয়, ধর্মের ভেদেও একই ভাষায় ভেদ দেখা যেতে পারে। যেখানে জাতপাতের ভেদাভেদ ব্যাপক, সেখানে জাতি (Caste) ভেদে ভাষায় ভেদ দেখা যেতে পারে। বয়সের পার্থক্যের জন্য ভাষায় ভিন্নতা দেখা যায়, আবার লিঙ্গের পার্থ্যক্যের জন্য অর্থাৎ নারী পুরুষ ভেদে ভাষার ভিন্নতা প্রতিফলিত হয়। এ সমস্ত সামাজিক বা পরিস্থিতিগত (তথারীতিগত) হেতুর সঙ্গে ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, এবং পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় ভাষাবৈচিত্র্যে'।[১] গবেষণায় নির্বাচিত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলি সমানভাবে প্রযোজ্য।

উপন্যাসের বিষয় ও ভাষার একাত্মতা একটি অবিকল্প শিল্পশর্ত। এটা ঠিক যে ভাষা উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্র প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এর অতিরিক্ত বিষয় ভাষার মধ্যে চলমান। উপন্যাসকারের উপন্যাসের অভিপ্রেতকে সার্বিকভাবে প্রকাশ করার মাধ্যম ভাষা। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের চরিত্র, বিষয়, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সংলাপ, ইতিহাস, কাব্যগুণ (উপমা, চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার) নাটকীয়তা, সামাজিক প্রবাদ-প্রবচন, দুঃখ-আনন্দ প্রভৃতি এই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে। কিন্তু মনে রাখার বিষয় বাংলা উপন্যাস কেবল মান্য বাংলা ভাষার মাধ্যমেই লেখা চলে না; অঞ্চল ভেদে সেই ভাষা কখনো উপভাষা, বিভাষা, নিভাষার ব্যবহারের কাম্য হয়ে ওঠে। কেননা কোনো গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস রচনার সময় ঔপন্যাসিক টিভি, সংবাদপত্র, বেতার, শ্রেণিকক্ষের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা— সেই উপন্যাসের উপযোগী ভাষা হয়ে ওঠে না। তা ঘটলে সেই উপন্যাস বাস্তবিক হয়ে উঠতে পারে না। ফলে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনা সার্থক হতে অসুবিধায় সম্মুখীন হয়। বিশেষত কোন আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা তো আরো ভীষণভাবে প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে এই বিষয়ের একটি অসুবিধার কথা বলতে হয় যে উপন্যাসের লোকায়ত জনগোষ্ঠীকে জীবন্ত করে তুলে ধরতে সংলাপের ভাষায় যদি সেই অঞ্চলের নিজস্ব বাক্‌শৈলী তুলে ধরা যায়, তাহলে উপন্যাসকার সেই অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা জানলেও বেশির ভাগ পাঠকের সেই ভাষা বোধগম্য হয় না, আবার নাগরিক ভাষা প্রয়োগ

করলে চরিত্র অস্বাভাবিক হয় ওঠে। তাই ঔপন্যাসিককে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেই হয়। যাতে করে দুদিকেরই সমতা বজায় থাকে। কিন্তু লোকায়ত উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অনেকটা বেশি দেখা যায়। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি যেহেতু গোষ্ঠীর সৃষ্টি, ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে সেখানে অঞ্চলের ছাপ থাকবে সেটা বলাই বাহুল্য। এবং আমরা সহজেই সেটিকে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের তা সহজে নিরূপণ করতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১. মৃণাল নাথ, 'ভাষা ও সমাজ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ৫৯

সপ্তম অধ্যায়:

বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিকলোকসংস্কৃতির শিল্পমূল্য

বর্তমান গবেষণা কর্মের এই শেষতম অধ্যায়ে বিচার্যের বিষয় – নির্বাচিত তথা আলোচিত বাংলা উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিল্পমূল্য কতখানি বা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নিরিখে বাংলা উপন্যাসের নির্ধারণ কতখানি যুক্তিযুক্ত অথবা এও প্রশ্ন আসে – বাংলা উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির তাৎপর্য নির্ণয়ের কারণ কী ? এ যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টাতেই এই অধ্যায়ের উদ্দিষ্ট তো বটেই, এমনকি গবেষণার মুখ্য অভিমুখ তথা লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর।

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি কারা, বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে এদের যোগ, বাংলা উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পরিবেশন, তার বিষয় বৈচিত্র্য, তাতে

প্রকাশিত জাতি, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই আলোচিত হয়েছে নিগুঢ় বিশ্লেষণে। তাতে করে ইতোমধ্যেই একথা স্পষ্ট-বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলির তাৎপর্য বহুলতা— তবে কেন, কীভাবে এ বিশ্লেষণ এখনও বাকি। সেই বিশ্লেষণের সম্পূর্ণতা আনতেই এ অধ্যায়ের উপস্থাপন।

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির যে শিল্পমূল্য রয়েছে— এ ব্যাপারে প্রথম সমর্থনমূলক প্রবন্ধ লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যখন তাঁর সামনে লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা-সংগ্রহ বা চর্চার কোনরকম নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা পথ ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা অনেক বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছিলেন হৃদয়বৃত্তিকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'মেয়েলি ছড়া' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) প্রকাশ করছেন একটি প্রবন্ধ। 'সাধনা'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৩০২ এ প্রকাশিত হচ্ছে 'গুপ্ত রত্নোদ্বার' নামে একটি প্রবন্ধ, যা পরবর্তীতে গ্রন্থভুক্তির সময় 'কবি সঙ্গীত' বলে পরিচিত। আর ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যার ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' তে প্রকাশিত হয় 'গ্রাম্য সাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধ। গদ্য গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগ হিসেবে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে ১০ই শ্রাবণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে লোকসাহিত্য প্রকাশ করেন সুহাসচন্দ্র মজুমদার। তাতে উপরোক্ত এই তিনটি প্রবন্ধের অন্তর্গত ছিল। 'মেয়েলি ছড়া' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি কালীন হয় 'ছেলেভুলানো ছড়া'।

'ছেলেভুলানো ছড়া'—প্রবন্ধের পটভূমিকায় সরলা রায়কে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৭ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'ইংরেজিতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাঙলার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে। আপনই যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড় উপকার হয়। ছড়া যতই অর্থহীন সামান্য তুচ্ছ এবং চলিত হউক্ না কেন আমার নিকট তাহা বহুমূল্য। এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ও দৃশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং অনেক তুচ্ছ কথার মধ্যে গভীর কবিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। যদি এরূপ সংগ্রহক্ষম কাহাকেও পান তবে তাহাকে বলিয়া যেন গ্রাম্যতা অথবা কুরুচি

দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শব্দ সমষ্টিকেও সামান্য জ্ঞান না করেন।’[২]

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ এদের গুরুত্বের শিলমোহর দিয়ে গেছেন বলেই কি এহেন লোকসংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব নির্ণীত হয়েছে? আসলে চিন্তাশীল, সচেতন রবীন্দ্রনাথ বাঙালির শিক্ষাক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যানুসরণকে, ইংরেজি ভাষার প্রতি আনুগত্যকে লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন এ দেশীয় সম্পদকে সংরক্ষণ করবার গুরুত্বকে। শুধু ইংরেজমুখীনতা এরিয়ে গুরুত্ব দেবেন বলেই নয়। বাস্তবিকই যে, সেগুলি গুরুত্ব এবং মর্যাদার অধিকারী— এটা সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই উপলব্ধি করেছিলেন। আর সে কারণেই যে মানুষটি মূলত আপাদমস্তক কবি, জীবনের শেষতম মুহূর্ত পর্যন্ত, যিনি কবি বলেই পরিচিত হতে চেয়েছেন, সেই কবি ব্যক্তিত্বটিই ছড়ার মত আপাত তুচ্ছ বিষয়ে খুঁজে পেলেন ‘সহজ কবিত্বকে’, আমাদের শেকড়কে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ছড়ার আত্মগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ছড়ার যে একাধিক বিশেষত্বগুলির উপর আলোকপাত করলেন, তা হল—

রবীন্দ্রনাথ-কৃত এ বিশ্লেষণ ছড়ার যে বিশেষত্ব গুলি উঠে আসে, তার সাথে বর্তমান কালের কালগত ব্যবধান সত্ত্বেও, এখনও এসকল বিশেষত্বের গুরুত্ব বজায় রয়েছে— তা পরবর্তী অংশে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবেই শুধুমাত্র ছড়াই নয়, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকভাষা, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত লোকসংস্কৃতিরই গুরুত্ব ও মর্যাদাতে অপরিসীম— সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে আপাতত আলোচনার বিষয়, বাংলা উপন্যাসে এই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিল্পমূল্য। ‘শিল্পমূল্য’ শব্দটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, বিষয়টি কতখানি শিল্প সফল ? তাকে কতখানি শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যায় ? প্রভৃতি।

গবেষণার নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিল্পমূল্য নির্ণয়ের প্রশ্নটি - উপন্যাস ব্যতীত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির শিল্পমূল্য কতখানি ? সাধারণভাবে বাক্‌কেন্দ্রিক

লোকসংস্কৃতিগুলি অপরিশীলিত, অ-শিক্ষিত, অ-মার্জিত লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট। সেক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়– তাই যদি হয়, তবে তো খুব স্বাভাবিকভাবে পরিশীলিত মননের প্রকাশ থাকে না, বুদ্ধিদীপ্ততা থাকে না। তাহলে তা শিল্পমূল্য পেতে পারে কীভাবে ? তবে একথা ঠিক যে, বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলি কোনরকম মার্জিত মানদণ্ডের নিরিখে সৃষ্টি হয় না। ছড়াগুলিতে থাকে না চিন্তাশীল কবিত্বের সচেষ্ট প্রয়াস, কোনো ছন্দের experiment, লোকসঙ্গীতগুলিতে থাকে না কোনো লিখিত স্বরলিপির নির্ণয়ন। আগে থেকে প্রস্তুত থাকে না কোনো কথা, কোনো ভাব। এসবটাই যেন প্রকৃতিজাত। প্রকৃতিই এদের উৎস। তাই-তো বহতা নদীর বুকেই জন্ম নেয় ভাটিয়ালি গানের কথা, সুর আর প্রশিক্ষণহীন ভাটিয়ালের গায়ক। যার কোনো নাগরিক মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। নদীর বুকেই তার জন্ম, তার উপরেও সে সুরের আনাগোনা। বলা বাহুল্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বা কক্ষ ও জীবন ভাবনার মুখোমুখি করতে পারে— ‘জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ’। এ তো কোন ‘বানিয়ে তোলা’ বিষয় নয়। জীবনের যাপনের সঙ্গে এর অন্বয়। কাজেই এর শেকড় আলগা হলেই মাটি থেকে উঠে আসে। আর তখনই তার যে essence তা নষ্ট হতে থাকে। এই আলগা তুচ্ছ নাগরিক মানদণ্ডে বিবেচিত মানসে তা অনেক সময়েই অবহেলিত থেকে গেছে। উপন্যাস একসময় তাকে আত্তীকরণ করেছে। আর সেই আত্তীকরণ কতটা সফল হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি—সে জিজ্ঞাসা সূত্রেই এগিয়ে যাওয়া থাক অভিমুখে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা), ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ (ষোড়শ খণ্ড) ‘গ্রন্থ পরিচয়’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০১, পৃ ৯৮৮

উপসংহার

‘নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য (১৯৫১-২০০০)’ শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাকর্মটিতে সাতটি অধ্যায়ের বিন্যাসে গবেষণার অভিপ্রেত অভিমুখে পৌঁছনোর প্রয়াস করেছি বিশ্লেষণাত্মক এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে। লোকসংস্কৃতির পোশাকি নাম উনিশ শতক থেকে পরিচিত হতে শুরু করলেও ‘লোক’ এবং ‘সংস্কৃতি’ উভয়েরই উৎস এবং উৎপত্তি নির্ণয় সাল-তারিখের গণনার বাইরে। কেননা সংস্কারের সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্রটি অনস্বীকার্য নয়। আর এ সংস্কার মানুষের মজ্জাগত একটি বিষয়। যা আবার ‘স্থায়িভাব’ এর উত্তরাধিকার। আর এ যাবতীয় সংস্কার মানুষের জন্মগত। কাজেই এই মানুষ তথা ‘লোক’ কিংবা ‘সংস্কার’ এর পরবর্তী পর্যায় ‘সংস্কৃতি’ এর সবটাই প্রাচীন। আর বাংলা উপন্যাস নামক সংরূপটি তো উপনিবেশের কালে আবির্ভাব তার।

বর্তমান গবেষণাকর্মে ১৯৫১-২০০০ এই নির্দিষ্ট কালপর্বের উপন্যাসে বিশেষত বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে দেখাতে চেয়েছি। তবে ১৯৫১ সালের আগে এবং ২০০০ সালের পরেও এর বহুলতা রয়েছে। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিগুলিই উপন্যাসের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে বিশেষভাবে। এর অন্যতম কারণ, কেবলমাত্র বাক্‌নির্ভর লোকসংস্কৃতিগুলিই উপন্যাসের আখ্যানে পরিবেশনযোগ্য। বাক্‌ কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পরিবেশনের একটা নিজস্বতা রয়েছে। একটা পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রয়েছে। এমনতর একটা বিষয় অন্য একটি শিল্পমাধ্যমে পরিবেশিত হলে তার যে আস্বাদন বা তাৎপর্য সেটা কি বজায় থাকে নাকি নষ্ট হয়ে যায় ? এই জিজ্ঞাসাটিও এ গবেষণার সঙ্গে একান্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা, নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে বাক্‌নির্ভর এই লোকসংস্কৃতিগুলি বলাই বাহুল্য, শুধুমাত্র যে তার নীরস, অনুভূতিহীন, নিছক আখ্যানের নতুনত্বের তাগিদে উল্লিখিত হয়েছে তাই নয়। বরং, সেই নির্দিষ্ট সমাজ, সেই নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, সেই নির্দিষ্ট ডায়ালেক্ট এই সমস্ত কিছুর প্রতিই নিষ্ঠাবান থেকেছেন ঔপন্যাসিকেরা। আর এমনতর একটা বিষয় যা বর্তমানে বহু গবেষকের গবেষণার বিষয়ীভূত হয়ে ওঠার বাইরেও উপন্যাস তেমন একটা

জায়গা তৈরি করতে পেরেছে যাতে গবেষকের বাইরেও সাধারণ পাঠক সেই বিশেষ সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করছেন, জানছেন। এই জানবার, বোঝবার আগ্রহ বা আকর্ষণটাই এই ইতিবাচকতা দেয় এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের।

যে-কোনো গবেষণার প্রত্যাশিত জায়গা পরবর্তী অভিমুখটিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। এ গবেষণাটির ক্ষেত্রেও তেমন একটি অভিমুখ তৈরি হয় যে, উপন্যাসে পরিবেশিত লোকসংস্কৃতি বা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বাস্তবিক লোকসংস্কৃতির যে একটা তুলনামূলক জায়গা রয়েছে সেটাকে তুলে ধরা এবং পর্যবেক্ষণ করা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৩।

২. মনোজ বসু, 'জলজঙ্গল', নতুন মুদ্রণ, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৪১৫।

৩. আবু ইসহাক, 'সূর্য দীঘল বাড়ী', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৪১৯।

৪. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দ্বাবিংশ প্রকাশ, কলকাতা, পুথিঘর, মাঘ ১৪১৫।

৫. সমরেশ বসু, 'সমরেশ বসুর রচনাবলী২' 'গঙ্গা', চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ ২০১২।

৬. আব্দুল জব্বার, 'ইলিশমারির চর', পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, কলকাতা, লেখা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০০৯।

৭. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'মায়ামৃদঙ্গ', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৪।

৮. সাধন চট্টোপাধায়, 'উপন্যাস সমগ্র', 'গহিন গাঙ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বৈশাখ, ১৪১৮।

৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহিষকুড়ার উপকথা', প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৬।

১০. অভিজিৎ সেন, 'রহু চণ্ডালের হাড়', প্রথম জে.এন.সি.সংস্করণ, কলকাতা জে.এন.চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, ডিসেম্বর ২০১০

১১. অনিল ঘড়াই, 'নুনবাড়ি' প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৬।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস। 'কবি'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, রত্নাবলী, ডিসেম্বর ২০০৫।

২. অচিন্ত্য বিশ্বাস। 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ডিসেম্বর ২০০৬।

৩. অতুল সুর। 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস'। প্রথম পরিবর্তিত আনন্দ সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৩৯৩।

৪. অতুল সুর। 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, সাহিত্যলোক, নভেম্বর ১৪২১।

৫. অসীম দাস। 'বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯১।

৬. অরূপকুমার দাস (সম্পা)। 'তিতাস একটি নদীর নাম জীবন, সৃজন ও রূপায়ন' দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৬।

৭. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী।'লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)'। প্রথম নয়া উদ্যোগ সংস্করণ। কলকাতা,নয়া উদ্যোগ, ২০১২।

৮. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। 'লোক-সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)', প্রথম নয়া উদ্যোগ সংস্কারণ। কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১৩।

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি'। তৃতীয় মুদ্রণ। নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯১।

১০. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (ষষ্ঠ খণ্ড)। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭২।

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য'। প্রথম সংস্করণ । কলকাতা, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ. লি, অগ্রহায়ন ১৩৮০।

১২. আশিস পাল। 'নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে বাংলা লোকসাহিত্য'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি, ২০০১

১৩. উদয় চাঁদ দাস ও ড.বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পা)। 'নদীমাতৃক উপন্যাসধারায় গঙ্গা সৃষ্টি-সমীক্ষা'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, শিলালিপি, মে ২০০২।

১৪. ক্ষিতিমোহন সেন। 'ভারতের সংস্কৃতি'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯।

১৫. গুণময় মান্না । 'বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক' (আধুনিক যুগ)। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, নভেম্বর ১৯৯৫।

১৬. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত । 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া'। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ । কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১৫।

১৭. তনিমা চক্রবর্তী । 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোকঐতিহ্য'। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ৩রা জুলাই ২০১১।

১৮. তুষার চট্টোপাধায়। 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান'। দ্বিতীয় সংস্করণ । কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা: লি:, বইমেলা ১৪০১।

১৯. তুষার চট্টোপাধায়। 'লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৫।

২০. তপোধীর ভট্টাচার্য। 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ'। প্রথম প্রকাশ । কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০০।

২১. দেবীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পা)। 'বারমাসী গান ও অন্যান্য' । প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, প্রণীতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

২২. দিব্যজ্যোতি মজুমদার। 'লোককথার লিখিত ঐতিহ্য'। প্রথম প্রকাশ । কলকাতা, গাঙচিল, আগষ্ট ২০০৯।

২৩. দেবব্রত নস্কর। 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৯ ।

২৪. ধনপতি বাগ (ভাষান্তর)। 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড' । চতুর্থ মুর্দ্রণ। কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০১৬।

২৫. নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা)। 'কবিতা রত্নাকর'। সরস্বতিকুঞ্জ সংস্করণ। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ ।

২৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক। বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা'। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৯।

২৭. নির্মলকুমার বসু। 'হিন্দু সমাজের গড়ন'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ফাল্গুন ১৩৯১।

২৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক। 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, এপ্রিল ১৯৭৯।

২৯. নির্মলকুমার বসু। 'হিন্দুসমাজের গড়ন'। পুনর্মুদ্রণ । কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯১।

৩০. নীহাররঞ্জন রায়। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব)। সপ্তম সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৬।

৩১. মজহারুল ইসলাম। 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন'। প্রথম পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

৩২. পল্লব সেনগুপ্ত। 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ'। পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০।

৩৩. পল্লব সেনগুপ্ত। 'লোককথার অন্তর্লোক' । প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০০০।

৩৪. পবিত্র সরকার। 'লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

৩৫. ফাদার দ্যতিয়েন (সম্পা)। 'ইতিহাসমালা'। গাঙচিল দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা, গাঙচিল, নভেম্বর ২০১১।

৩৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ'। দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ। কলকাতা অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০০৪।

৩৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা)। 'বাঙলার লোকসংস্কৃতি'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।